International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-XI, December 2016, Page No. 27-36
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www,irjims,com

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে ভিন্নভাষী চরিত্র

শুভাশিস ব্যানার্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক, আসানসোল বি বি কলেজ, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

I feel a great attraction toward Bengali Short Stories since childhood. Rabindranath Tagore's Creation in that field enriched my feelings time and again. The day I read 'Kabuliwala', I have been in love with multiligual characters. For the sake of earning livelihood the Bengalees scattcred themselves in various provinces as well as in various parts of the world. Consequently, it has its reflection in various branches of literature. It is not of today, this impact is clear since Rabindranath's days. In this context we need to say that the characters outside Bengal as well as non-Indians have not lost their identity in the gathering of Bengali speaking characters rather by the ingerous touch of the pen of Story writers. This type of characters enriehed the world of Bengali short stories and this process is still going on. Sometimes the story writers expressed the languages in Lucid Bengali and that did not creat any negative effect on the acceptability of the characters, rather their genuine appeal moved the Bengali readers.

Since The British period when Kolkata, the then Calautta was the capital of India, we have been acquainted with the multilingual characters. We come across 'Kabuliwala', who may be called the first authentic multilingual character. Apart from 'Kabuliwala' mention may be made of 'Dalia', 'Kshudita Pashan' and 'Laboratory'. The effect of gorgeousness has been increased by the cry of Meher Ali- 'every thing is lie, be away' and the episode of spirits likening those in the Arabian Nights. Sohini, a Punjabi girl in the short story 'Laboratary' is a powerful stair in modernism. Introduction of Dalia, a character of Nawab regime has expressed the talent of Tagore in a dynamic form.

Key Word: Rabindranath, Short Story, Multilingual, characters, Kabuliwala.

কৈশোর থেকে বাংলা ছোট' গল্পের প্রতি একটা গভীর আকর্ষণ অনুভব করি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টি আমার সেই অনুভবকে বারবার সমৃদ্ধ করেছে। যেদিন 'কাবুলিওয়ালা' পড়েছি সেই দিন থেকেই বাংলা ছোট' গল্পের ভিন্নভাষার চরিত্রগুলি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতবর্ষের মতো একটি বিশাল দেশে নানা ভাষাভাষী লোকের বাস। তাই বাংলা ছোট' গল্প কেবল মাত্র বাংলাভাষী চরিত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। কেননা সাহিত্যের সর্বকনিষ্ঠ এই শাখাটি অতি সমৃদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন চরিত্র, বিভিন্ন প্রদেশ, ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির কথা বর্ণনা করে। বাংলা ছোট' গল্প দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছে, তাই কখনো কখনো সাগর পারের কিছু চরিত্রও বাংলা গল্পে দেখা গেছে। বৈচিত্রপূর্ণ বাংলা ছোটগল্পের এই দিকটি আমাকে আকৃষ্ট করেছে।

জীবনযাপনের তাগিদে বাঙালী ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিজেদের ছড়িয়ে দিয়েছে। তার ফলে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সেই জীবন যাত্রার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে। এ শুধু আজ নয়, রবীন্দ্রযুগ থেকেই এই প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন এই যে, বাংলা সাহিত্যে যেসকল ভিন্নভাষী চরিত্র যথা বিভিন্ন আদিবাসী চরিত্র, বহিবঙ্গ ও বহিভারতের ভিন্নভাষী চরিত্র ইত্যাদির চরিত্রায়ণে গল্পকারেরা এমনই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যাতে অন্যান্য বাংলাভাষী চরিত্রের ভিড়ে তারা হারিয়ে যায়নি, বরং বাংলা ছোটগল্পের জগৎকে তারা রীতিমতো পুষ্ট করেছে এবং এখনো করে চলেছে। কখনো কখনো গল্পকারেরা সেই চরিত্রের মুখের ভাষাকে সাবলীল ভাবে বাংলাভাষায় প্রকাশ করেছেন, তাতে চরিত্রগুলোর গ্রহণযোগ্যতা এতটুকু কমেনি, বরং তাদের আন্তরিক আবেদন বাঙালী পাঠককে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে।

বৃটিশ আমল থেকে যখন কলকাতা ভারতের রাজধানী রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে তখন থেকে আমাদের সাহিত্যেও আমরা ভিন্নভাষী চরিত্রদের পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের ছোট' গল্পে আমরা পেলাম কাবুলিওয়ালাকে। বলা যেতে পারে বাংলা ছোট গল্পের জগতে প্রথম সার্থক ভিন্নভাষী চরিত্র। তাছাড়া 'দালিয়া', 'ক্ষুধিত পাষাণ' এবং 'ল্যাবরেটরি' গল্পের কথাও বলা যায়। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের পাগল মেহের আলীর চীৎকার 'সব ঝুটহ্যায়, তফাত্ যাও' এবং আরব্যরজনীর মতো সেইসব আত্মার কথা, যারা কেউ বাঙালী না হয়েও এই গল্পের গরিমাকে আরো বাড়িয়েছে। 'ল্যাবরেটরি' গল্পে পাঞ্জাবী মেয়ে সোহিনী আধুনিকতার একটি বলিষ্ট সোপান। নবাবী আমলের চরিত্র দালিয়া যেন রূপকথার গল্প। 'দুরাশা' গল্পের বদ্রাত্তনকুমারীর শেষ বিলাপ বেশ কিছু প্রশ্নের জন্ম দিয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' চরিত্রটি আসলে আফগানিস্থানের চরিত্র। লেখক এখানে শাশ্বত পিতৃহৃদয়ের স্নেহক্ষুধার বর্ণনা করতে গিয়ে এই আফগান চরিত্রটি উপস্থাপন করেছেন। লেখককন্যা পাঁচ বছরের মিনির সঙ্গে কলকাতায় ঐ কাবুলিওয়ালার পরিচয় ও বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। আবার ভারতবর্ষ যখন মোগল সম্রাটের শাসনাধীন, তখন বিভিন্ন প্রদেশগুলি ছিল নবাবদের দখলে। সেই নবাবদের ভাষা, সংহতি আদব কায়দা 'দালিয়া' গল্পে খুঁজে পেয়েছি। বহু আরবী ও ফার্সী শব্দ এই সময়ে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। বাংলা ছোট'গল্পে এই ভাষার সার্থক প্রয়োগ ঘটে। 'দালিয়া' গল্পটি তাই সবদিক দিয়েই আলোচনার দাবি রাখে। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের অতিপ্রাকৃত পরিবেশ সৃষ্টিতে অশরীরী আত্মার ক্রন্দনেও নবাবী আমলের ছাপ রয়েছে। এই আত্মাগুলি আসলে ইরানের বাঈজীদের। 'ল্যাবরেটরি' গল্পের ইঞ্জিনিয়ার বাবুটি বাঙালী হয়েও ইচ্ছে করেই পাঞ্জাবী মেয়ে সোহিনীকে বিয়ে করেছিল। তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন এই পাঞ্জাবী মেয়েটি যে করেই হোক তার ল্যাবরেটরি রক্ষা করতে পারবে, কোনো বাঙালী মেয়ের পক্ষে তা করা সম্ভব হবে না। তারপর সারা গল্প জুড়ে আমরা সেই পাঞ্জাবী মেয়েটির দুঃসাহস লক্ষ্য করেছি। বদ্রাত্তনকুমারীর আর্তনাদ এবং তার প্রেমের জন্য ত্যাগ স্বীকার-দুটোই খুব দেশ-কালের নিরিখে আশ্চর্য ঠেকেছে আমাদের চোখে।

ছোটগল্পের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন অগ্রপথিক ছিলেন, তেমনি বাংলা ছোটগল্পে বিদেশী, ভিন্নভাষী তথা অবাঙালী চরিত্র অঙ্কনে তিনিই প্রথম তাঁর মূল্যবান প্রতিভার স্বীকৃতি রেখে গেছেন। তিনিই প্রথম বাংলা ছোটগল্পের পটভূমি ও চরিত্রকে বাংলা ও বাঙালীর বাইরে স্থাপন করলেন। বিশ্বমানবিক বোধে উত্তরিত রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর ভূগোলকে যেন বিস্তারিত করলেন। তিনি সহজেই রূপ দিতে পারলেন সুদূর আফগানিস্থান থেকে আসা রহমত কাবুলিওয়ালাকে। সেই চরিত্রকে তিনি কোলকাতার পরিবেশে বাঙালীর শৈশবের সঙ্গে মিশিয়ে শাশ্বত পিতৃত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণ করলেন। খণ্ড খণ্ড হিন্দী, আধো আধো বাংলা উচ্চারণে কাবুলিওয়ালা ও মিনি-এই দুটো চরিত্রই সাবলীল ভাবে ফুটে উঠেছে। আবার 'দুরাশা' গল্পের বদ্রাওনকুমারীকে তিনি খুঁজে পেলেন দার্জিলিং গিয়ে। দার্জিলিং বরাবরই বাংলার মধ্যে অবাঙালীর বিচরণভূমি। বাঙালী সেখানে পর্যটক মাত্র। রবীন্দ্রনাথও পর্যটক রূপেই আবিষ্কার করেছেন বদ্রাওনকুমারীকে। নবাবী আমলের ঘটনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন 'দালিয়া' গল্পটি। এই

মুঘল আমলের চরিত্রগুলি নিয়ে বাংলা গল্পের জাল বোনা, পরবর্তী কালের লেখকরা যা আরো নিপুণভাবে প্রয়োগ করেছেন-তার পথও রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ অতি সার্থকভাবে 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের পটভূমিকে বাংলার বাইরে নিয়ে গেছেন। অতি অপরিচিত পরিবেশে তা আরো নিপুণভাবে ধরা দিয়েছে। মেহের আলীর চীৎকারে বাংলা পাঠক যেন বাংলাদেশ থেকে হায়দ্রাবাদের নিজাম প্যালেসের সতর্ক বাণী শুনতে পাচ্ছে। 'ল্যাবরেটরি' গল্পে পাঞ্জাব ও পাঞ্জাবী নারী চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বাংলা ছোটগল্পে। পাঞ্জাবী মেয়ে সোহিনী কোথাও বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা বলেনি। কিন্তু বাঙালী ইঞ্জিনিয়ারের পাঞ্জাবী বৌয়ের রণহুঙ্কার চরিত্রটির মূল উপজীব্য বিষয়। সোহিনীর পাঞ্জাবী সত্তাটির জন্যই গল্পটিতে অবাঙালী স্বাদ এত প্রবলভাবে ধরা পড়েছে। মাত্র পাঁচটি গল্প আলোচনা করলেই রবীন্দ্রনাথের এই অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে তিনি বাংলা ও বাঙালীর বাইরে বাংলা ছোটগল্পের জগৎকে নিয়ে গেছেন। তাছাড়া আরো বেশ কিছু গল্পে পার্শ্বচরিত্র রূপে বেশ কিছু সাহেব, কুলি, দারোয়ান চরিত্র পাওয়া যায়, যেমন 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের সাহেব চরিত্রটি।

দালিয়া: আরকান রাজের পটভূমিকায় রচিত এই কাহিনির তিনটি মুখ্য চরিত্র-আমিনা, জুলিখা ও দালিয়া। পরাজিত শা সুজা ঔরঙ্গজীবের ভয়ে আরাকান রাজের আশ্রয়ের চলে আসেন। তাঁর তিন সুন্দরী কন্যা ছিল। আরাকান রাজের ইচ্ছে ছিল রাজপুত্রদের সঙ্গে তিন কন্যার বিয়ে হোক। এই প্রস্তাব শুনে সুজা অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আরাকান রাজা ছলনা করে সুজাকে নদীমধ্যে নৌকাডুবির ব্যবস্থা করে। সুজা বেগতিক দেখে কনিষ্ঠা কন্যা আমিনাকে জলে নিক্ষেপ করে দেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা আত্মাহত্যা করে। সুজার এক বিশ্বাসী কর্মচারী রহমত আলি জুলিখাকে নিয়ে সাঁতার কেটে পালিয়ে যায়। সুজা যুদ্ধ করতে করতে মরেছে।

কিছুকাল পরে বৃদ্ধ ধীবরের কাছে মানুষ হওয়া আমিনা 'তিন্নি' নামে বড় হয়ে উঠেছে। তিন্নি তথা আমিনার সন্ধান পেয়ে জুলিখা তার কাছে এসেছে। সে চায় তাদের পিতৃহত্যার বদলা নিতে। সে আমিনাকেও এই অনুপ্রেরণা দিতে চায়। কিন্তু আমিনা 'দালিয়া' বলে একটি ছেলেকে ভালোবাসে। এই দালিয়া আমিনার দৃষ্টিভঙ্গীকে বদলে দিয়েছে। আবার দালিয়াও আমিনার প্রেম ও শাসনে দ্বিধাহীন ভাবে ধরা দিয়েছে।

যেমন আমিনা দালিয়াকে ধমকের সুরে বলেছে ''ফের! ছোট মুখে বুড়ো কথা! কবে তুমি তিন্নির চোখ টিপিয়াছ। তোমার তো সাহস কম নয়।''[1] জুলিখা প্রথম প্রথম এই সম্পর্ককে মেনে নিতে পারছিল না। ক্রমশঃ তাদের দুজনের সরল ও সহজপ্রেমকে জুলিখাও সমর্থন করলো। জুলিখা তাই আমিনাকে বলেছে-''সত্য করিয়া বল্ দেখি আমিনা, তুই যে বলিতেছিলি পৃথিবীটা তোর বড়ো ভালো লাগিতেছে, সে কি ঐ বর্বর যুবকটার জন্য।''[2]

আমিনা উত্তরে বলেছে-''তা, সত্য কথা বলি দিদি, ও আমার অনেক উপকার করে। ফুলটা ফলটা পড়িয়া দেয়, শিকার করিয়া আনে, একটা কিছু কাজ করিতে ডাকিলে ছুটিয়া আসে। অনেকবার মনে করি উহাকে শাসন করিব। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। যদি খুব চোখ রাঙাইয়া বলি, 'দালিয়া, তোমার প্রতি আমি ভারি অসন্তুষ্ট হইয়াছি।' দালিয়া মুখের দিকে চাহিয়া পরম কৌতুকে নিঃশব্দে হাসিতে থাকে। এদের দেশে পরিহাস বোধ করি এই রকম; দু ঘা মারিলে ভারি খুশি হইয়া উঠে তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। এই দেখ না, ঘরে পুরিয়াছি-বড়ো আনন্দে আছে, দ্বার খুলিলেই দেখিতে পাইব মুখ চক্ষু লাল করিয়া মনের সুখে আগুনে ফুঁ দিতেছে। ইহাকে লইয়া কী করি বলতো বোন্। আমি তো আর পারিয়া উঠি না।''[3]

ক্রমশঃ এই প্রেম স্বাভাবিক ও সাবলীল রূপ নিয়ে এমনই পর্যায়ে উন্নীত যে জুলিখা দালিয়াকে একদিন না দেখতে পেলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতো-''অবশেষে এমন হইল, কোনোদিন যুবকের আসিতে বিলম্ব হইলে আমিনা যেমন উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত জুলিখাও তেমনি আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিত এবং উভয়ে একত্র হইলে, চিত্রকর নিজের সদ্যসমাপ্ত ছবি ঈষৎ দূর হইতে যেমন করিয়া দেখে, তেমনি করিয়া স্নেহে সহাস্যে নিরীক্ষণ করিয়া

দেখিত। কোনো কোনো দিন মৌখিক ঝগড়াও করিত, ছল করিয়া ভৎর্সনা করিত, আমিনাকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া যুবকের মিলন বেগ প্রতিহত করিত।''[4]

হঠাৎ রহমত শেখ জুলিখাকে গোপনে চিঠি পাঠায়-''আরাকানের নূতন রাজা ধীবরের কুটিরে দুই ভগ্নীর সন্ধান পাইয়াছেন এবং গোপনে আমিনাকে দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন। তাহাকে বিবাহার্থে অবিলম্বে প্রাসাদ আনিবার আয়োজন করিতেছেন। প্রতিহিংসার এমন সুন্দর অবসর আর পাওয়া যাইবে না।''[5] এই রহমত শেষই জুলিখাকে বাঁচিয়েছিল। সে এখন ছদ্মবেশে আরাকান রাজসভায় বর্তমান।

যাইহোক রাজার ইচ্ছায় কর্ম। দুটি পালকিতে দুই বোন রওনা হয়ে গেল। দুঃখ বিরহে আমিনার দুটি চোখ শেষবারের মতো দেখতে চাইলো দালিয়াকে। কিন্তু দালিয়ার দেখা নেই। জুলিখার পরামর্শে একটি ছুরিও কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আমিনা। দুই বোন বাসরঘরে গিয়ে পৌঁছালো। প্রতিহিংসার দুই জোড়া চোখ জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। ক্লাইম্যাক্স যখন আসন্ন, তখনই দেখা গেল-রাজা মৃদু মৃদু হাসিতে প্রতীক্ষা করছেন দুই বোনের জন্য। এই রাজা আর কেউ নন্, সে আমিনার প্রেমিক দালিয়া, আর ''দালিয়া চুপ করিয়া হাস্যমুখে উভয়ের প্রতি চাহিয়া রহিল, ছুরিও তাহার খাপের মধ্য হইতে একটুখানি মুখ বাহির করিয়া এই রঙ্গ দেখিয়া খিক্ খিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।''[6]

ক্ষুধিত পাষাণ: বিদেশী পটভূমিকা ও অবাঙালী চরিত্র নিয়ে যতগুলি গল্প লেখা হয়েছে তার মধ্যে 'ক্ষুধিত পাষাণ' উল্লেখযোগ্য। এই গল্পের কথক হলেন এক পশ্চিম দেশীয় মুসলমান। শ্রোতা হলেন লেখকও তাঁর থিওসফিস্ট এক বন্ধু। গল্পবক্তার সঙ্গে গল্পের দুই শ্রোতার পরিচয় স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, সেখানে তারা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এই গল্পের নায়ক অবশ্যই ঐ কথক, যিনি কর্মসূত্রে জুনাগড় থেকে হায়দ্রাবাদের বরীচ অঞ্চলে নিজাম সরকারে এসেছেন। তিনি সরকারি ভাষায় তুলার মাশুল কালেক্টর। কালেক্টর সাহেব ঘটনাক্রমে বরীচ অঞ্চলের তুলার হাট ও লোকালয় থেকে খানিকটা দূরে আরাবল্লী পাহাড়ের নিকট একটি পাথরের তৈরী প্রাচীন অট্টালিকায় থাকবার ব্যবস্থা করেন। অফিসের বৃদ্ধ কেরানী করিম খাঁ ও ভৃত্যরা তাকে সেখানে রাত্রে থাকতে নিষেধ করে। লোকশ্রুতি আছে যে সেখানে নাকি প্রেতাত্মা আছে এবং রাত্রের অন্ধকারে সেই অশরীরী আত্মার ক্রন্দন মানুষকে মোহাবিষ্ট করে।

তুলার মাশুল কালেক্টর এইসব কথাকে বিশ্বাস না করেই সেই প্রকাণ্ড বাড়িতে থাকার জন্য মনস্থির করলেন। এরপর তিনি একদিন প্রাসাদ সংলগ্ন সিঁড়িতে বসে উপলব্ধি করেন কতগুলি নারীর পদশব্দ। তারা নাকি সকলে দেড়শো সিঁড়ি অতিক্রম করে সামনের সুপ্তা নদীতে স্নান করে পুনরায় ফিরে গেল। এই ভৌতিক অনুভূতিকে দিনের আলোতে তাঁর আজগুবি বলে মনে হতো। কিন্তু সন্ধ্যা নামতেই কীসের আকর্ষণে তাকে যেন সমস্ত বাড়ীটা কাছে টেনে নিত। ''আমার দিনের সহিত রাত্রের ভারি একটা বিরোধ বাধিয়া গেল। দিনের বেলায় শ্রান্তক্লান্ত দেহে কর্ম করিতে যাইতাম এবং শূন্য স্বপ্নময়ী মায়াবিনী রাত্রিকে অভিসম্পাত করিতে থাকিতাম আবার সন্ধ্যার পরে আমার দিনের বেলাকার কর্মবদ্ধ অস্তিত্বকে অত্যন্ত তুচ্ছ মিথ্যা এবং হাস্যকর বলিয়া বোধ হইত।

সন্ধ্যার পরে আমি একটা নেশার জালের মধ্যে বিহ্বলভাবে জড়াইয়া পড়িতাম। শত শত বৎসর পূর্বেকার কোনো এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর একটা অপূর্ব ব্যক্তি হইয়া উঠিতাম, তখন আর বিলাতি খাটো কোর্তা এবং আঁট প্যান্টলুনে আমাকে মানাইত না। তখন আমি মাথায় এক লাল মখমলের ফেজ তুলিয়া ঢিলা-পায়জামা, ফুল-কাটা কাবা এবং রেশমের দীর্ঘ চোগা পরিয়া, রঙিন রুমালে আতর মাখিয়া বহু যত্নে সাজ করিতাম এবং সিগারেট ফেলিয়া দিয়া গোলাপজল পূর্ণ বহু কুন্দলায়িত বৃহৎ আলবোলা লইয়া এক উচ্চগদিবিশিষ্ট বড় কেদারায় বসিতাম। যেন রাত্রে কোনো এক অপূর্ব প্রিয় সম্মিলনের জন্য পরমাগ্রহে প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম।''[7]

একদিন রাত্রিবেলায় তিনি এক অশরীরী আত্মার অঙ্গুলি নির্দেশে ঘুমের ঘোরে সারা বাড়িময় ঘুরে বেড়ান। কখনো কখনো অতিপ্রাকৃত পরিমণ্ডলে সেই অশরীরী আত্মার শরীরী রূপের খানিক ঝলকও দেখতে পান। তাঁর এই বাড়িটার প্রতি আকর্ষণ আরো তীব্রতর হয়ে ওঠে। হঠাৎ মোহ কাটিয়ে চেতনা ফিরে পান ভোরের দিকে পাগল মেহের আলীর চীৎকারে- ''তফাত যাও, তফাত যাও। সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়''[8]

এই রাত্রির নির্যাতনে অর্ধোন্মাদ কালেক্টর সাহেব প্রাসাদ ত্যাগ করে অফিসে চলে যান। কিন্তু সূর্য ডুবতেই কীসের আকর্ষণে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আসেন প্রাসাদে। আজপ্রাসাদে আলোর চিহ্ন নেই, শুধুই অন্ধকার। এই অন্ধকার পরিচ্ছেদে কালেক্টর সাহেব অভিমানী, বিরহী নারী প্রেতাত্মার তীব্র অসন্তোষ ও অসহায় ক্রন্দনের ছবি দেখলেন। সম্পূর্ণভাবে মোহের অন্ধকারে নাগপাশের মতো যখন তিনি বিদ্ধ, ঠিক সেই সময়েই মেহের আলীর সেই চীৎকার কালেক্টর সাহেবকে বাঁচিয়ে দেয়। হয়তো মেহের আলীও এই ভাবেই থাকতে থাকতে পাগল হয়ে আজ প্রাসাদের চারপাশে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। এখনো তার মুক্তি ঘটেনি।

প্রাণ ফিরে পেয়ে কালেক্টর সাহেব ফিরে গেছে তার অফিসে। এই ব্যাধি থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজতে চান তিনি। অসহায় ভাবে করিম খাঁকে বলেছেন-''আমার উদ্ধারের কি কোনো পথ নেই।'' উত্তরে করিম খাঁ বলেছে-''একটি মাত্র উপায় আছে, তাহা অত্যন্ত দুরূহ। তাহা তোমাকে বলিতেছি-কিন্তু তৎপূর্বে ওই গুলবাগের একটি ইরানী ক্রীতদাসীর পুরাতন ইতিহাস বলা আবশ্যক। তেমন আশ্চর্য এবং তেমন হৃদয় বিদারক ঘটনা সংসারে আর কখনও ঘটে নাই।''[9] কিন্তু এই কাহিনি বলার আগেই কুলি খবর দেয় প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢুকছে। লেখকদের আর গল্প শোনা হয় নি।

দুরাশা: রবীন্দ্রনাথের এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বদ্রাত্তনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী অর্থাৎ বদ্রাত্তন কুমারী। লেখকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় দার্জিলিঙের ক্যালকাটা রোডে। কান্নার আওয়াজ শুনে লেখক সামনে গিয়ে দেখলেন ''গৈরিক বসনাবৃতা নারী, তাহার মস্তকের স্বর্ণ কপিশ জটাভার চূড়া আকারে আবদ্ধ, পথ প্রান্তে শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া মৃদুস্বরে ক্রন্দন করিতেছে।''[10] এরপর লেখক হিন্দী ভাষায় জিজ্ঞাসা করেছেন-''কে তুমি, তোমার কী হইয়াছে।'' উত্তর না পেয়ে আবার বলেছেন-''আমাকে ভয় করিয়ো না। আমি ভদ্রলোক।''[11] এর পর বদ্রাত্তনকুমারী একটু হেসে খাস হিন্দুস্থানীতে বলেছে-''বহুদিন হইতে ভয়ডরের মাথা খাইয়া বসিয়া আছি, লজ্জা শরমও নাই। বাবুজি, একসময় আমি যে জেনানায় ছিলাম সেখানে আমার সহোদর ভাইকে প্রবেশ করিতে হইলেও অনুমতি লইতে হইত, আজ বিশ্বসংসারে আমার পর্দা নাই।''[12]

এরপর বদ্রাত্তন কুমারী তার নিজের জীবনের কাহিনি বলেছেন, সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় এই কাহিনি শুরু হয়েছে। তার লক্ষ্ণৌ-এর নবাবের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু তখনই ''...এমন সময় দাঁতে টোটা কাটা লইয়া সিপাহিলোকের সহিত সরকার বাহাদুরের লড়াই বাধিল, কামানের ধোঁয়ায় হিন্দুস্থান অন্ধকার হইয়া গেল।''[13]

তাদের কেল্লাটি ছিল যমুনা নদীর তীরে। তাদের সেনাবাহিনির অধিনায়ক ছিলেন কেশরলাল নামে এক হিন্দুব্রাহ্মণ, কেশরলাল পরম হিন্দু। খুব ভোরে যমুনার জলে স্নান করে প্রদক্ষিণ করতে করতে নবোদিত সূর্যর উদ্দেশে অঞ্জলি প্রদান করতো। অট্টালিকার জানালা থেকে এই দৃশ্য প্রতিদিন দেখতেন রাজকুমারী। এখান থেকেই অনুরাগের জন্ম। তিনি নিজে মুসলমান ধর্মের কিছুই জানতেন না। কিন্তু কেশরলালের জন্য হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে নানা কৌতুহল তাঁর মনে উদ্রেক হত। এক হিন্দুদাসীর দ্বারা তিনি জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেতেন, তিনি দাসীর মধ্য দিয়ে কেশরলালকে 'ব্রাহ্মন ভোজনের' ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু 'কেশরলাল ঠাকুর কাহারও অন্নগ্রহণ বা দান প্রতিগ্রহ করেন না।' এই ভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-কোনো ভাবেই তাঁর ভক্তিচিহ্ন তিনি কেশরলালকে দেখাতে পারেন নি।

এমন সময় সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলো। কিন্তু নবাব ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে রাজী হলেন না। সেনা অধিনায়ক কেশরলাল যুদ্ধের জন্য তৈরী ছিলেন। তার চাপে প্রথমে যুদ্ধে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেও বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজসেনাদের ডেকে দিলেন নবাব। নবাব কন্যা পুরুষের ছদ্মবেশে যুদ্ধ করতে করতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তিনিই শেষপর্যন্ত আহত ও প্রায়মৃত কেশরলালকে প্রথম দেখতে পেলেন। দেখতে পেয়েই তাঁর প্রাথমিক যা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা তিনি লেখককে বলেছেন- ''প্রথমেই আমি আমার বহুদিনের বুভুক্ষিত ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিলাম। কেশরলালের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আমার আজানুবিলম্বিত কেশজাল উন্মুক্ত করিয়া দিয়া তাঁহার পদধূলি মুছিয়া লইলাম, আমার উত্তপ্ত ললাটে তাঁহার হিমশীতল পাদপদ্ম তুলিয়া লইলাম, তাঁহার চরণ চুম্বন করিবামাত্র বহুদিবসের নিরুদ্ধ অশ্রুরাশি উদ্বেল হইয়া উঠিল।''[14] কেশরলালের চেতনা ফিরল, কিন্তু রাজকুমারীর দেওয়া জল সে মুখে নিতে চাইল না। কেননা কেশরলাল নিজেই উঠে দাঁড়ালো। একটি ফাঁকা নৌকা নিয়েই রাত্রের অন্ধকারে যমুনা নদীতে হারিয়ে গেল। এই দৃশ্যটি রাজকুমারীর অন্তরে গাঁথা হয়ে রইলো। যাবার আগে ভূলুণ্ঠিত হয়ে তিনি কেশরলালকে প্রণামও করেছিলেন। কিন্তু কেশরলালের ক্রোধ স্তিমিত হয়নি।

এরপর রাজকুমারী যোগিনীর বেশে কাশীর শিবানন্দস্বামীকে পিতা সম্বোধন করে তাঁর কাছে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। সে সময় তিনি সেখানে বসেই কেশরলালের খবর পেতেন। কেশরলাল তাঁতিয়া টোপীর দলে মিশে কখনো পূর্বে, কখনো পশ্চিমে, কখনো ঈশানে, কখনো নৈঋতে বিপ্লবীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, ক্রমে ক্রমে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন ব্রিটিশ শাসক দখল করে নিল। কেশরলালের আর কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না। রাজকুমারীও গুরুদেবের আশ্রয় ত্যাগ করে ভৈরবী বেশে পথে পথে, তীর্থে তীর্থে, মঠে মন্দিরে কেশরলালের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এভাবে ত্রিশ বছর কেটে গেল। তিনি একদিকে যেমন কেশরলালের খোঁজ করতে লাগলেন অন্যদিকে তেমনি এই বীরবিপ্লবীর উপযুক্ত পাত্রী হওয়ার জন্য আচারে ব্যবহারে কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণও হলেন।

এমন সময় তিনি সংবাদ পেলেন কেশরলাল বর্তমানে নেপালে আছেন। নেপালে এসে রাজকুমারী তার সন্ধান পাননি। তারপর থেকেই তিনি পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই ভূটিয়া দেশে আচার বিচারহীন পরিবেশে তিনি ধর্মসঙ্কটে পড়েছেন। তরুন কেশরলালের আশায় তিনি স্থান ত্যাগ করতে পারেন নি। তারপর হঠাৎ-''আটত্রিশ বৎসর পরে এই দার্জিলিঙে আসিয়া আজপ্রাতঃ কালে কেশরলালের দেখা পাইয়াছি।''[15]

কি দেখলেন নবাবপুত্রী? তিনি দেখলেন -''দেখিলাম, বৃদ্ধ কেশরলাল ভুটিয়া পল্লীতে ভুটিয়া স্ত্রী এবং তাহার গর্ভজাত পৌত্র পৌত্রী লইয়া ম্লানবস্ত্রে মলিন অঙ্গনে ভূট্টা হইতে শস্য সংগ্রহ করিতেছে।''[16]

এই কথা শুনে লেখক কেশরলালের কোনো দোষ না দেখতে পেয়ে বলেছেন- ''আটত্রিশ বৎসর একাদিক্রমে যাহাকে প্রাণভরে বিজাতীয়ের সংস্রবে অহরহ থাকিতে হইয়াছে সে কেমন করিয়া আপন আচার রক্ষা করিবে।''[17]

নবাবকন্যা এই যুক্তির প্রতিবাদ করছেন না। তার দুঃখটা অন্য জায়গায়। ''...যে ব্রহ্মণ্য আমার কিশোর হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল আমি কি জানিতাম তাহা অভ্যাস তাহা সংস্কার মাত্র। আমি জানিতাম তাহা ধর্ম, তাহা অনাদি অনন্ত। ... হায় ব্রাহ্মণ, তুমি তো তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ জীবনের পরিবর্তে আর এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।''[18]

এই প্রশ্নচিহ্ন পাঠক কে এক গভীর তত্ত্বের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। এই মুসলমান ব্রাহ্মণীর গল্প বাংলা সাহিত্যে প্রায় বিরল।

ল্যাবরেটরি: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবাঙালী মহিলা চরিত্রদের মধ্যে পাঞ্জাবী মেয়ে সোহিনী অনবদ্য। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার নন্দকিশোর মল্লিক ছিলেন বুদ্ধিমান মানুষ। তাঁর লক্ষ্য ছিল বিজ্ঞানের সাধনা ও পৃথিবীসেরা ল্যাবরেটরি বানানো। যা অর্থ রোজগার করতেন তার সবটাই এই সাধনার জন্য। ব্যবসার তাগিদে

পাঞ্জাবে গেলে সোহিনীর সঙ্গে আলাপ। দেনার দায়ে তার আইমার বাড়ি ঘর বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। সেই দেনা নন্দকিশোর যেন শোধ করে দেন। দেনা সাতহাজার টাকা। তার বিনিময়ে সে নন্দকিশোরের সারা জীবনের সঙ্গী হতে রাজী। তার অকপট স্বীকারোক্তি-"...অনেক পুরুষকেই আমি ভুলিয়েছি, কিন্তু আমার উপরেও টেক্কা দিতে পারে এমন পুরুষ আজ দেখলুম। আমাকে তুমি ছেড়ো না বাবু। তাহলে তুমি ঠক্‌বে।"[19]

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অপঘাতে একদিন নন্দকিশোরের মৃত্যু হল। তাঁর আত্মীয়রা মামলা করে সোহিনীকে তাড়াবার চেষ্টা করলে। ফল হল উল্টো, আইনের প্যাঁচ বুঝে, নারীর মোহজাল বিস্তার করে সোহিনী মামলা জিতলে এবং দূর সম্পর্কের দেওরকে জেলেও পুরে দিল।

আজ ল্যাবরেটরিকে রক্ষা করার জন্য সোহিনী দায়বদ্ধ। যে কোনো উপায়েই সে তার লক্ষ্যে অবিচল। তাই উপযুক্ত এক বিজ্ঞান ছাত্রের খোঁজে অধ্যাপক চৌধূরীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সোহিনী। অকপট চরিত্রস্খলনের নানা ঘটনা দিয়ে লেখক সোহিনীকে গড়ে তুলেছেন। অধ্যাপক ও সোহিনীর সংলাপের মধ্য দিয়ে এই রূপ নানা ঘটনা ফুটে উঠেছে। সোহিনীর মেয়ে নীলা প্রথমে এক মাড়োয়ারি ছেলেকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু ছেলেটি টাইফয়েডে মারা যায়। এখন রোহিনীর পছন্দ বেবতী ভট্টাচার্য্যকে। তাই বেশী প্রয়োজন অধ্যাপকে চৌধূরীকে। তিনিই পারেন বেবতীর সব খোঁজখবর আনতে। দেহের অপবিত্রতা সোহিনীকে কোনোদিন বেশী ভাবায় নি। কিন্তু তার স্বামীর বিজ্ঞান সাধনার ল্যাবরেটরিকে সে কিছুতেই ধ্বংস হতে দেবে না। তাই তিনি অধ্যাপক চৌধুরীকে বলেছেন "...আমার শুকনো পাঞ্জাবি মন। আমি সমাজের আইনকানুন ভাসিয়ে দিতে পারি দেহের টানে পড়ে, কিন্তু প্রাণ গেলেও বেইমানি করতে পারব না। আমার ল্যাবরেটরির এক পয়সাও তারা খসাতে পারেনি। আমার প্রাণ শক্ত পাথর হয়ে চেপে আছে আমার দেবতার ভাণ্ডারের দ্বার। ওদের সাধ্য নেই যে পাথর গলাবে। আমাকে যিনি বেছে এনেছিলেন তিনি ভুল করেন নি।"[20]

বোটানিকল গার্ডেনে নীলাকে সাজিয়ে রেবতী ভট্টাচার্য্যের মন গলানোর চেষ্টা করলো সোহিনী। সম্পূর্ণ সফল হল। নীলার রূপ যৌবনে আকৃষ্ট হয়ে বেবতী এলো। কিন্তু সোহিনী নীলাকে তার কাছ থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করলো, কেননা নীলার থেকেও তার প্রয়োজন এই বেবতীকে। সেই পারে ল্যাবরেটরির যথার্থ উত্তরসূরী হতে। নীলার ভাবগতি সোহিনীর ভালো লাগেনা। কারণ সে নিজেও জানে নীলা কোন পথে কী ভাবে চলতে চাইছে। সোহিনীর এই মনোভাব বলিষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তারই একটি উক্তিতে " দেখুন চৌধুরী মশায়, রেখে দিন ফিলজফি। মানব না আপনার অদৃষ্ট, মানব না আপনার কার্যকারণের অমোঘ বিধান, যদি আমার ল্যাবরেটরির পরে কারও হাত পড়ে। আমি পাঞ্জাবের মেয়ে, আমার হাতে ছুরি খেলে সহজে। আমি খুন করতে পারি তা সে আমার নিজের মেয়ে হোক, আমার জামাই-পদের উমেদার হোক।"[21]

> *"...আমি বাঙালির মেয়ে নই, ভালোবাসা নিয়ে কেবল চোখের জল ফেলে কান্নাকাটি করিনে। ভালোবাসার জন্যে প্রাণ দিতে পারি, প্রাণ নিতে পারি। আমার ল্যাবরেটরি আর আমার বুকের কলিজা, তার মাঝখানে রয়েছে এই ছুরি।"*[22]

কিন্তু হঠাৎ সোহিনীকে আম্বালয়ে যেতে হয়, সেখানে তার আইমা এখন মরণাপন্ন, অধ্যাপক চৌধূরী মশায়ও একটি বিশেষ কাজে গুজরানওয়ালায় চলে যান, সোহিনী যাবার আগে চার জন শিখসিপাইকে ল্যাবরেটরির পাহারায় রেখে যায়। তবু নীলাকে আটকানো গেল না। সে তার মোহজাল বিস্তার করে রেবতীকে বশ করে ফেলল। টেনে নিয়ে এল ল্যাবরেটরির বাইরে। জাগানী ক্লাবের সভাপতি করে দিল। ক্রমে ক্রমে রেবতীর কাছে নীলা হল মুখ্য আর ল্যাবরেটরি গৌণ। বিজ্ঞানী রেবতীর পৌরুষ জেগে উঠেত লাগলো নীলার ছোঁয়ায়, নীলা জানে এই রকম একটি পুরুষকে বিয়ে করলে টাকার মালিকও সে হবে আবার ইচ্ছে মতো ঘরে-বাইরে জীবনটাকেও উপভোগ করতে

পারবে। কেবল দরকার আইনের কিছু ফাঁক ফোঁকর। সোহিনীর অনুপস্থিতিতে বন্ধুদের নিয়ে এই পরামর্শ চলছিল নীলার। রেবতী সেখানে দাবার গুটি। অবশ্য সোহিনীও রেবতীকে সেই ভাবেই ব্যবহার করতে চায়।

এমন সময় সোহিনীর আবির্ভাব। নীলার এই ষড়যন্ত্র সোহিনী আন্দাজ করতে পারে। নীলা তার পিতার সম্পত্তির দাবী জানাতে গেলে সোহিনী গর্জে ওঠে ''কে তোর বাবা, কার সম্পত্তির শেয়ার চাস ?'' এটি শুনে আকাশ থেকে পরে নীলা। নন্দকিশোর মল্লিক তার বাবা নয়, এটা তার বাবাও জানতেন তবু তিনি সোহিনীকে স্থান দিয়েছেন। একথা তিনি অন্যভাবে অধ্যাপককে বলেওছেন- ''...যেখানে আমি ছিলেম ছোট সেখানে আমি তাঁর চোখে পাড়ি নি, যেখানে আমি ছিলুম বড়ো সেখানে তিনি আমাকে পুরো সম্মান দিয়েছেন। আমার মূল্য যদি তাঁর চোখে না পড়ত তা হলে আমি কোথায় তলিয়ে যেতুম বলুন তো। আমি খুব খারাপ, কিন্তু আমি নিজেই বলছি আমি খুব ভালো, নইলে তিনি আমাকে কখনো সহ্য করতে পারতেন না।''[23]

যাইহোক এই সব কথা শোনার পর সব বন্ধুরা কেটে পড়েছে। তবু রেবতীর মোহ কাটেনি। নীলার যৌবনের উজ্জ্বলতায় বিজ্ঞানী রেবতীর দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। এই ঘটনায় সোহিনীও বুঝতে পেরেছে ল্যাবরেটরির দায়িত্ব নেওয়ার যোগ্যতা নেই রেবতীর। নীলার কৃতকার্য তা প্রকাশ করে দেখিয়েছে। তাই কিছুটা হলেও সোহিনী যেন বিপদমুক্ত হতে পেরেছে। তাই গল্পের শেষে সোহিনী বলেছে- ''এই বার আমার মেয়ে আমার ল্যাবরেটরিকে বাঁচিয়েছে। আমি লোক চিনতে পারি নি, কিন্তু আমার মেয়ে ঠিক বুঝেছিল যে ল্যাবরেটরিতে গোয়ালঘর বসিয়ে দিয়েছিলুম-গোবরের কুণ্ডে আর একটু হলেই ডুবত সমস্ত জিনিসটা।''[24]

গল্পের শেষে রেবতী ফিরে গেছে তার পিসিমার কাছে। সোহিনীর হয়তো নতুন ভাবে আরো কোনো বিজ্ঞানীর খোঁজকরবে। কেননা তার স্বামীর সঙ্গে সে কিছুতেই বেইমানী করতে পারবে না। তাতে যা হবার হবে। এই রূপ চরিত্র বাংলা ছোটগল্পে বিরল।

কাবুলিওয়ালা: রহমত শেখ কাবুলিওয়ালা বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক বিদেশী চরিত্র। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে ব্যাক্তিগত স্নেহবন্ধন ও পারিবারিক বন্ধনকে অতিক্রম করে বিদেশী রুক্ষদর্শন পুরুষ মূর্ত্তির সঙ্গে বাঙালি ঘরের একটি ছোট্ট মেয়ে মিনির ক্ষণস্থায়ী প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং লেখক নিজেকে পিতার আসনে বসিয়ে বিষাদগ্রস্ত এই পুরুষ মূর্ত্তির পিতৃহৃদয়ের স্নেহকারুণ্য অনুভব করেছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত কন্যাস্নেহ পারিবারিক গণ্ডি ছাড়িয়ে ব্যাপক অনুভবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। এই গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র কাবুলিওয়ালার মধ্যে সেই পিতৃহৃদয়ের স্নেহসুধা গল্পটিকে প্রাণরস দান করেছে।

কাবুলিওয়ালার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন ''ময়লা ঢিলা কাপড় পরা ঝুলি ঘাড়ে হাতে গোটা দুই চার আঙুরের বাক্স একটা লম্বা কাবুলিওয়ালা মৃদুমন্দ গমনে যাইতেছিল।''[25] এমন লেখকের পাঁচ বছরের কন্যা মিনি 'কাবুলিওয়ালা ও কাবুলিওয়ালা' বলে চিৎকার করে ডাকতে থাকে এবং কাবুলিওয়ালা যখন হাসি মুখে তাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসে তখন মিনি 'ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল।' লেখক সহাস্য কাবুলিওয়ালার প্রতি মিনির অমূলক ভয় ভাঙানোর জন্য তার সঙ্গে কাবুলিওয়ালার পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই ভাবেই তাদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত।

এরপর এক সাহিত্যিকের শিশুকন্যা মিনির সঙ্গে সুদূর আফগানিস্থানের অধিবাসী হিং, মেওয়া, পেস্তা বিক্রেতা রহমত কাবুলিওয়ালার নিবিড় সখ্যতার সেতু রচিত হয়েছে। তার 'ঝুলির মধ্যে 'হাঁতি' আছে', 'খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি কখুনু যাবে না,' 'হামি সসুরকে মারবে'[26] ইত্যাদি সংলাপে তার আপাত দীর্ঘ অবয়বের অন্তরালে শাশ্বত পিতৃহৃদয়ের স্নেহশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। জীবিকার তাগিদে সে শিশু কন্যাটিকে সুদূর আফগানিস্থানে ফেলে আসতে বাধ্য হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে সেই স্মৃতির বেদনা তাকে মিনির কাছে নিয়ে আসতো। কিছুক্ষণের জন্য মিনির সঙ্গে হাসিকান্না খেলাধূলায় মেতে উঠতো। এই অভিলাষে মিনির জন্য তার সাধ্যের অতিরিক্ত উপহার আনা চায়,

কিন্তু স্নেহের বিনিময়ে সে অর্থ নিতে চায় না। মিনির বাবা মূল্য দিতে গেলে সে দুঃখ পায়। আসলে মিনির মধ্যে সে খুঁজে পেত মিনির সময়বয়সী তার ছোট্ট মেয়েটিকে। তার পিতৃহৃদয় সুখের জোয়ারে কানায় কানায় ভরে উঠতো।

কিন্তু তাদের স্বপ্ন সুখের নীড় কিছুদিনের মধ্যেই ভেঙে গেল। ন্যায্য পাওনার দাবীতে বঞ্চিত রহমত তার ক্রোধ সংবরণ করতে না পেরে এক প্রতিবেশিকে ছুরি মারে। এই সাংঘাতিক অপরাধে রহমতের জেল হয়ে যায়। এরপর সাত বছর কেটে গেছে। মিনিরও বয়স বেড়ে গেছে, এমন সময়ে মিনির বিয়ের দিনেই রহমত্ জেল থেকে ছাড়া পায়। রহমত্-এর দীর্ঘ কারা জীবনে কোনো পরিবর্তন না ঘটলেও বাইরের জগতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। রহমত্ তার পিতৃ হৃদয়ের স্নেহ সুধা নিয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে মিনি তার শৈশবের বন্ধুত্বকে ভুলে গেছে। তাই সেই দিনের ছোট্ট মিনি আজ আর কাবুলিওয়ালাকে চিনতে পারে না, তার সঙ্গে দেখা করতে অস্বস্তি বোধ করে।

রাঙা চেলি পরা, কপালে চন্দন আঁকা বধুবেশিনী মিনি কাবুলিওয়ালার কাছে আসতে সংকোচবোধ করে, এমনকি রহমতের 'খোঁকি তুমি শ্বশুর বাড়ি যাবে?' প্রশ্নশুনে লজ্জা পেয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের পুরানো বন্ধুত্ব ফিরে না পেয়ে কাবুলিওয়ালার মন ব্যথায় ভরে ওঠে। বাস্তব জগতের নিষ্ঠুর আঘাতে কাবুলিওয়ালা প্রকৃতই নিঃস্ব হয়ে যায়। মনে পড়ে আফগানিস্থানে তার ছোট্ট মেয়ের কথা। হঠাৎ সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো-''তাহার মেয়েটিও এরূপ বড় হইয়াছে। তাহার সঙ্গে আবার নতুন করে আলাপ করিতে হইবে, ঠিক সেই পূর্বের মত আর তেমনটি পাইবে না।''[27]

ধূসর কালিমাখা ছোট্ট হাতের ছাপ বুকে নিয়ে বেড়ানোর আর কোনো অর্থ আছে কি না সে বুঝতে পারে না। সে আজ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মিনির পিতাকে ছোট্ট হাতের ছাপটি দেখায়। কন্যাকে বিদায় দেবার লগ্নে বেদনামথিত মিনির পিতা সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন- ''সেও যে, আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্বত-গৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল।''[28] লেখক নিঃস্ব রহমতকে একখানি নোট দিয়ে দেশে মেয়ের কাছে ফিরে যেতে বললেন। এমনকি অর্থের অভাবে বিবাহ অনুষ্ঠানের দু একটি অঙ্গ বাদ দিলেন। ইলেকট্রিক আলো তেমনভাবে জ্বালাতে পারলেন না, গড়ের বাদ্য আর বাজালো না। তবে লেখক পিতৃহৃদয়ের সেই বেদনাকে হৃদয়ে উপলব্ধি করতে পারলেন- ''...মঙ্গল-আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।''[29]

পিতৃহৃদয়ের যে শাশ্বত চিরন্তন অমৃত ধারা দেশকালের ক্ষুদ্র সীমাকে অতিক্রম করে ক্রমনিয়ত প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আচার-আচরণ-ভাষা, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক অবস্থানে অসংখ্য প্রভেদ থাকলেও পৃথিবীর সকল পিতাই সেই অমৃতে অবগাহন করেছেন। সেখানে আপাত রুক্ষ্ম খুনি কাবুলিওয়ালার সঙ্গে শিক্ষিত মার্জিত রুচিশীল মিনির পিতার কোনো পার্থক্য নেই। মরুপর্বত ময় আফগানিস্থান আর নদী-মাতৃক বাংলাদেশ সেখানে সমপংক্তিভুক্ত, সেখানে পৃথিবীর সকল পিতা স্নেহের স্নিগ্ধ সুধা বিতরণে সমান উদার, সন্তানকে ভালোবাসার অমৃত উজাড় করে দিতে সকল পিতাই অকৃপণ। এই সহজ সত্যের শৈল্পিক রূপ ফুটে উঠেছে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে।

সূত্রনির্দেশ:

1) পৃষ্ঠা 50, দালিয়া, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পগুচ্ছ, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, কলিকাতা
2) ঐ
3) পৃষ্ঠা- 50-51, ঐ
4) পৃষ্ঠা- 52, ঐ

5) ঐ
6) পৃষ্ঠা- 54, ঐ
7) পৃষ্ঠা-323, ক্ষুধিত পাষাণ, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ, দ্বিতীয় খণ্ড ঐ
8) পৃষ্ঠা- 325, ঐ
9) পৃষ্ঠা- 327 ঐ
10) পৃষ্ঠা- 347, দুরাশা, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ, ঐ
11) ঐ
12) ঐ
13) পৃষ্ঠা- 349, ঐ
14) পৃষ্ঠা- 352, ঐ
15) পৃষ্ঠা- 356, ঐ
16) ঐ
17) ঐ
18) ঐ
19) পৃষ্ঠা- 695, ল্যাবরেটরি, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ, চতুর্থ খণ্ড, ঐ
20) পৃষ্ঠা- 702, ঐ
21) পৃষ্ঠা-714, ঐ
22) ঐ
23) পৃষ্ঠা- 711, ঐ
24) পৃষ্ঠা- 723, ঐ
25) পৃষ্ঠা-110, কাবুলিওয়ালা, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ, 1ম খণ্ড, ঐ
26) পৃষ্ঠা-111, ঐ
27) পৃষ্ঠা- 115, ঐ
28) ঐ
29) ঐ